Vol. II, Issue-I, 2022

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

সার্বিক মুক্তির ধারণা: ড: সর্বপল্লী রধাকৃষ্ণণ অনুসরণে একটি পর্যালোচনা

তনয় নন্দী

সারসংক্ষেপ

ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন, মানুষ হল সসীম - অসীম সত্তা। তার সসীম দেহধারী অস্তিত্বের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা আছে। সে সসীম পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেও উচ্চতর কোন কিছু লাভ করে। মানুষের সত্তা হল ঐ উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থা উপলব্ধির দিকে ক্রমাগত অগ্রগমন। দেহধারী জীবনের নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আত্মাকে যেতে হয়, কিন্তু এই সকল পর্যায়গুলো তার কেবল বিশ্রাম গ্রহণের জায়গা - তার লক্ষ্য নয়। তার নানান জন্ম তাকে কেবল এই এই সুবিধা দেয় যে তার অস্তিত্বের লক্ষ্য উপলব্ধির জন্য সে তার শক্তিকে চালিত করতে পারে। অস্তিত্বের এই লক্ষ্যই হল মানুষের পরম নিয়তি।

মানুষের নিয়তি নিহিত রয়েছে তার পরম মুক্তিতে। কিন্তু কী দিয়ে মুক্তি গঠিত হয় ? রাধাকৃষ্ণণের মতে, মানুষের সসীম দিকগুলি যদিও সৎ বা বাস্তব, তথাপি মানুষের স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব রয়েছে তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে। সুতরাং মুক্তি অর্থ হল পূর্ণ আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি। এটি দেবত্বের উপলব্ধিকেও সূচিত করে। তাই রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "মানবাত্মার নিয়তি হল পরম সত্তার সঙ্গে একত্বের উপলব্ধি"। জীবনের লক্ষ্য হল ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন, সত্তার পূর্ণ অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি। একে আত্মোপলব্ধিরূপেও বর্ণনা করা যায়, কেননা এটি আত্মার উচ্চতর স্বরূপের পরিপূর্ণ প্রকাশ।

আত্মার এই উচ্চতর পরিপূর্ণ প্রকাশের ফলে মানবাত্মার মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের প্রভেদ অবলুপ্ত হয়। তার মধ্যে ঘটে প্রকৃত আত্ম- সচেতনতা। তখন সে ব্যষ্টি মুক্তির কথা ভুলে গিয়ে সমষ্টি মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই সমষ্টি মুক্তিকেই ' সর্বমুক্তি ' বলে অভিহিত করেছেন। এটাই হল মানুষের পরম নিয়তি। আমার এই পেপারটির উদ্দেশ্য হল কীভাবে সার্বিক মুক্তির ধারণা লাভ করা যায় তা ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে অনুসরণ করে রূপরেখা তৈরি করা।

মূল শব্দ :- সসীম সত্তা, অসীম সত্তা, আত্মসচেতনতা, আত্মোপলব্ধি, সর্বমুক্তি ।

ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মানুষের প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে এক গভীর বাস্তববোধ ও চিন্তার ভারসাম্য দেখিয়েছেন। তাঁর দার্শনিক সিদ্ধান্তে দেখিয়েছেন মানুষ এক আধ্যাত্ম সত্তা এ কথা যেমন সত্য, তেমনি প্রাথমিকভাবে মানুষ দেহ ও মন সমন্বিত এক ব্যক্তি এ কথাও অনস্বীকার্য। দেহ-মনের অস্তিত্বের কারণে

মানুষ তার প্রবৃত্তি ও বাসনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আধ্যাত্মসত্তা হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে রয়েছে অহংশূন্যতা। আবার রক্তমাংসের জীব হওয়ার সুবাদে তার মধ্যে রয়েছে অহং এবং স্বার্থমগ্নতা। আধ্যাত্ম সত্তা হিসেবে মানুষ অহংকে অতিক্রম করে যেতে চায়, কিন্তু বাসনাবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ অহং-এর ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ থাকে।

প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকরা মানুষের জৈবিক সত্তা বা প্রাকৃতিক সত্তাকে কখনও কখনও খন্ডন করেন। রাধাকৃষ্ণণ তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তিনি তাই সমাধানের পথ খোঁজেন। তিনি বলেন মানুষের ক্রিয়াকলাপের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল যে মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য দিকগুলির মতো তার শ্রেণি-ধর্মের দ্বারা সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রকৃতির অন্যান্য দিকগুলির ক্ষেত্রে শ্রেণি-ধর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কেউ একটা পাথর বা উদ্ভিদ এমনকি নিম্নতর জন্তুর শ্রেণি-ধর্ম জেনে থাকে, তাহলে তা জেনেছে বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তেমনটা নয়। সাধারণভাবে মানুষের সাধারণ স্বরূপকে জেনে আমরা মানুষকে জানতে পারি না। বস্তুত ব্যক্তির বিশেষত্বকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এই অর্থেই মানুষকে অনুপম বা অনন্য বলে বর্ণনা করা হয়। রাধাকৃষ্ণণ তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতোই মনে করেন যে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধীয় কোনো আলোচনাই প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের এই অনন্যত্বকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

সকল প্রকার আত্ম-ক্রিয়ার মধ্যে অন্য আরেকটি বিশেষত্ব রয়েছে তা হল-মানুষের ক্রিয়াকলাপ পরিকল্পনামাফিক ও অন্তদৃষ্টিমুলক। প্রকৃতির অন্যান্য দিকগুলিতে তা নেই। মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য দিকগুলির মতো অন্ধভাবে ক্রিয়া করে না। যদি সে ইচ্ছা করে তাহলে আগে থেকেই লক্ষ্য নির্দিষ্ট করতে পারে এবং সেই লক্ষ্য লাভের জন্য সুগঠিত প্রয়াস চালাতে পারে। দার্শনিক দিক থেকে বলা যায়, মানুষের নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার ক্ষমতা আছে। একেই রাধাকৃষ্ণণ 'আত্ম-অতিক্রান্তি' বলেন। মানুষ নিজেকে অতিক্রম করতে পারে। সে সাধারণভাবে যেখানে পৌঁছায় তার থেকে অনেক উপরে

পৌঁছানোর কামনা করতে পারে। রাধাকৃষ্ণণের মতে এটি আত্ম-ক্রিয়ার একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক। এখন আমরা মানুষের দুটি দিকের স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারি।

রাধাকৃষ্ণণের মতে মানুষের সসীম দিকগুলি অভিজ্ঞতামূলক বা পরিবেশগত শর্তের দ্বারা নির্ধারিত। সাধারণভাবে, দৈহিক আত্মাকে মানুষের এই সসীম দিকের প্রতিভূরুপে বর্ণনা করা যেতে পারে। একে সসীম বলা হয়, কেননা এর নির্ধারকগুলি স্বয়ংজ্ঞাত শর্তের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন - জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা বা শারীরবিদ্যার দ্বারা নির্ধারণযোগ্য দিকগুলি বিবেচনা করা যাক। এই দিকগুলির একটি প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা আছে এবং ব্যাখ্যার শর্তগুলি এই সকল বৈজ্ঞানিক আলোচনার দ্বারা নির্ধারিত। এই দিকটির বিশেষত্ব হল যে, এই দিকটি দেহধারী মানুষকে একটি পরিবেশে বসবাসকারী একজন কর্তারুপে গণ্য করে। পরিবেশ থেকে নিরন্তর অন্তর্মুখী উদ্দীপনা মানুষের মধ্যে আসছে এবং ব্যক্তি এই উদ্দীপনায় যেভাবে সাড়া দিচ্ছে তার ভিত্তিতেই ব্যক্তির আচরণ ও চরিত্র নির্ধারিত হতে পারে। এরূপ সকল দৈহিক প্রতিক্রিয়াই উদ্দীপক-নিধারিত। মানুষের এই দিকটিকে রাধাকৃষ্ণণ নানান নাম দিয়েছেন- অভিজ্ঞতাভিত্তিক মানুষ, দৈহিক মানুষ, প্রাকৃতিক মানুষ, দৈহিক ব্যক্তি ইত্যাদি।

মানুষের সসীম অংশটির বাস্তবতা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, তা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতিষ্ঠত। এই বাস্তবতাকে রাধাকৃষ্ণণ অস্বীকার করেননি, এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা তাঁর অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে। কিন্তু দৈহিক দিকটি বাস্তব বা সৎ হলেও তা কেবল একটি স্তর বা দশা মাত্র, যাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে মানুষ যতক্ষণ সসীম স্তরে সীমাবদ্ধ ততক্ষনই সসীম দিকগুলির সত্তা রয়েছে। কিন্তু সসীম স্তরটি মানুষের চূড়ান্ত স্বরূপ নয়। এক্ষেত্রে কেউ আপত্তি করতে পারে যে সসীম দিকগুলিকে যদি শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করে যেতে হয়, তাহলে সেগুলি সৎ নয় রাধাকৃষ্ণণ বলবেন যে বিষয়টিকে ভুল বোঝার জন্যই এরূপ সংশয় হয়। উন্নয়ন বা বিকাশের 'একটি স্তর' বা 'একটি দশা' যে অর্থে সৎ, সেই অর্থে সসীম দিকগুলি সৎ। স্তরগুলি অতিক্রম না করা

পর্যন্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না। রাস্তায় ভ্রমণ করার সময় আমরা অনেক মাইল-ফলক অতিক্রম করে যাই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ফলকগুলিকে অতিক্রম করা মাত্রই সেগুলি অসৎ হয়ে যায়। কিন্তু তখন এও বুঝতে হবে যে কেউ যদি একটি নির্দিষ্ট মাইল-ফলকে থেমে যায়, তাহলে তার সম্মুখ-যাত্রা ব্যাহত হবে। এইভাবে মাইল-ফলক এক-একটি স্তর, লক্ষ্য নয়।

আমরা দেখলাম যে মানুষের স্বরূপের সামীম দিকটি গড়ে ওঠে ব্যক্তির দৈহিক ও জৈবিক দিকগুলিকে নিয়ে। আমরা এও দেখেছি যে সসীম দিকের মধ্যেও মানুষ অতিক্রান্তি সম্বন্ধে সদা সচেতন। এই সচেতনতাই তাকে সামনে এগিয়ে যেতে এবং দৈহিক দিকগুলিকে অতিক্রম করতে অনুপ্রাণিত করে। তাই, আত্ম-অতিক্রান্তির ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করলে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হবে। দৈহিক দিকটি প্রকৃতিবাদী শর্তের দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু কোনো ব্যক্তির মধ্যে লুকিয়ে থাকা আত্ম-অতিক্রান্তির ক্ষমতা সমন্ধে সচেতনতাকে সেভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তাই এটি যা কিছু ব্যবহারিক তা থেকে স্বতন্ত্র ও উচ্চতর। রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে এটাই মানুষের আত্মা। তাই মানুষের অসীম দিক গড়ে ওঠে তার আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে। 'আধ্যাত্মিক' শব্দটির সংক্ষিপ্ত ও সঠিক অর্থ প্রদান দুঃসাধ্য । কিন্তু রধাকৃষ্ণণ মনে করেন যে অন্তত মানুষের ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ বোধগম্য করা প্রাথমিকভাবে যতটা কঠিন বলে মনে হয় ততটা কঠিন নয়। মানবজীবনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে শব্দটির তাৎপর্য সুস্পষ্ট করা যেতে পারে। আধ্যাত্মিক বলে অভিহিত করা যায় এরূপ ক্রিয়াকলাপের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করতে হবে।

'আধ্যাত্মিক' শব্দটি ব্যবহারিক বিষয়ের থেকে উচ্চতর কোনোকিছুকে বোঝায়। ব্যবহারিক জগতে 'কর্তা' ও 'কর্মে'র মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সুতরাং যা ব্যবহারিক বিষয়ের থেকে উচ্চতর তা কর্তা-কর্মের দ্বিধাবিভাজনকে অবশ্যই অতিক্রম করে যায়। অন্তত একটা দৃষ্টান্ত আছে যার মধ্যে এই ভেদ অস্বীকৃত এবং তা হল আত্মসচেতনতার ঘটনা। আত্মসচেতনতায় আত্মা নিজের সমন্ধে সচেতন হয়, কর্তা স্বয়ং তার সচেতনতার বিষয়। আত্মসচেতনতা অবশ্যই আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ হবে।

আত্মসচেতনতার সঙ্গে সমন্ধযুক্ত অন্য আরেকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আছে। অন্তত মানুষের ক্ষেত্রে আত্মসচেতনতা হল বাদ্যযন্ত্রের একটি তারের মতো যা একজন ব্যক্তির সকল বিচক্ষণ অভিজ্ঞতাগুলিকে একত্রে বেঁধে রাখতে সক্ষম। একজন ব্যক্তি যে তাঁর নিজের সঙ্গে অভিন্ন থাকেন, তা কেবল এই কারণে যে তিনি সর্বদাই তাঁর স্বকীয় আত্মা সমন্ধে সচেতন থাকেন। তাই, আত্মসচেতনতা একজন ব্যক্তিকে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব দান করে।

এইভাবে, মানুষকে একটি আধ্যাত্মিক সত্তা রূপে অভিহিত করে রাধাকৃষ্ণণ বোঝাতে চান যে তিনিই আত্মসচেতন ব্যক্তি যিনি তাঁর আত্মসচেনতার ক্রিয়ার মধ্যে তাঁর সকল অভিজ্ঞতা ও ক্রিয়াকলাপকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম। ঐক্যবদ্ধ করার এই ক্ষমতার জন্যই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ দেখতে পান এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা রচনা করেন। এই ক্ষমতার ফলে তিনি তাঁর গতিবিধি সংগঠনে ও আধ্যাত্মিক বিকাশ আনয়নে সক্ষম হন। তাহলে এটাই হল মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। এই স্তরে মানুষ স্বাধীনভাবে কর্ম নির্বাচন করতে পারে, আবার তা স্বাধীনভাবে সম্পন্নও করতে পারে। মানুষ আধ্যাত্মিকতার উচ্চগ্রামে আরোহণ করতে পারে এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

আধ্যাত্মিক মানুষের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হল মুক্তি। রাধাকৃষ্ণণ মুক্তি বলতে আধ্যাত্মিকতার সারসত্তা গঠনকারীকে বোঝেন। তাঁর মতে কেবল ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার অধিকারী হওয়া সহজসাধ্য নয়। এর জন্যই নিজের মধ্যেই সংগ্রাম প্রয়োজন, নিজের বিরুদ্ধেই লড়াই প্রয়োজন- এ লড়াই অত্যন্ত দুরূহ। "অমানবীয় প্রকৃতি, অরণ্য, বন্যা ও বন্য জন্তুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ, কিন্তু আমাদের অন্তরের আবেগের বিরুদ্ধে, বিব্রত করে তোলা ভ্রান্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করা দুঃসাধ্য।" ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপের ফলে এরূপ আবেগ ও ভ্রান্তিগুলির সৃষ্টি হয়। তাই আসলে লড়াই হল ঐ ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অহমিকার বিরুদ্ধে, আত্মার অন্যান্য দাবির বিরুদ্ধে লড়াই। রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে এই লড়াই দুটি স্তরে

চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। প্রথম স্তরটি হল প্রস্তুতিমূলক স্তর এবং দ্বিতীয়টি চূড়ান্ত আঘাতের স্তর। প্রস্তুতিমূলক স্তর গড়ে ওঠে মানুষের কিছু বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আবেগময় পরিবর্তন আনয়নের মধ্য দিয়ে। প্রথম স্তরে রয়েছে উপদেশ, প্রার্থনা ও উপাসনা। দ্বিতীয় স্তরটি ধ্যান, অনুধ্যান ও ভালোবাসার স্তর। 'আত্মস্বীকৃতি এবং তার পন্থা' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রধাকৃষ্ণণ বলেন, "আত্মকর্তৃত্ব ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে একটি পরম অন্তর্মুখী বিশুদ্ধতা প্রয়োজন।" এই উক্তিতে 'আত্মকর্তৃত্ব' ও 'আত্মত্যাগ' - এই শব্দ দুটি প্রস্তুতিমূলক স্তরকে নির্দেশ করে এবং 'একটি পরম অন্তর্মুখী বিশুদ্ধতা' কথাটি দ্বিতীয় স্তরকে নির্দেশ করে।

প্রথম স্তরটি তপশ্চর্যার স্তর। 'লক্ষ্য লাভের জন্য মানবীয় স্বরূপের তপশ্চর্যা অবশ্য প্রয়োজন। দেহ ও মনের শুদ্ধি হল পূর্নতার উপায়'। মানুষের আবেগ ও অনুভূতিগুলিতে সংযম আনয়ন করাই মানবীয় স্বরূপের তপশ্চর্যার অর্থ। 'মনের শুদ্ধি' বলতে বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনকে বোঝায়। আর 'দেহের শুদ্ধি' বলতে নৈতিক তপশ্চর্যাকে বোঝায়। আর দ্বিতীয় পর্ব হল 'নীরব ধ্যান' এই পর্বে আমাদের আত্মা ইন্দ্রিয় ও অহং থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে নিরন্তর অসীমের ধ্যানে মগ্ন হয়। তিনি এই 'নীরব ধ্যান' এর পর্বটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন পদ ব্যবহার করেছেন, যেমন- যোগ, উপলব্ধি, ধ্যান, স্বজ্ঞামূলক চেতনা প্রভৃতি। যে ব্যক্তি এইরকম ধ্যানের ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন, তিনি এই পার্থিব জগতে বাস করেও যেন এই জগতে থাকবেন না। এই জগতে হাঁটা-চলা করেও জাগতিক বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। সার্বিক প্রেম, মুক্ত মন এবং আবেগহীনভাবে তিনি আত্ম-ত্যাগের অভ্যাস করে যাবেন। রাধাকৃষ্ণণের মতে মানুষের পরম নিয়তি হল মুক্তিলাভ করা। তার জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া। একেই তিনি 'আত্মোপলব্ধি' বলে উল্লেখ করেছেন। এই উপলব্ধি হল এমন এক বিরল মুহূর্তের উপলব্ধি যেখানে বিষয়-বিষয়ী, আমি- তুমি প্রভৃতি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক বিশ্বানুভূতি ঘটে যায়। এই অবস্থা হল পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ আনন্দের অবস্থা।

সত্তার এই উপলব্ধি হল কোনো ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি। সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ বলেন মুক্তিলাভের পরেও কোনো ব্যক্তি জগতে ব্যক্তি হিসেবে থেকে যান এবং অন্যের পরিত্রাণ বা মুক্তির জন্য কর্ম করেন। এর থেকেও প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তির ব্যক্তি -বিশেষত্ব বিলুপ্ত হয় না। তিনি নদী ও সমুদ্রে উপনিষদীয় উপমা ব্যবহার করে বলেন যে যদিও নদী সমুদ্রে হারিয়ে যায় বলে মনে হয়, তথাপি সমুদ্র ও নদী পরস্পরের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায় না। অর্থাৎ মুক্তিতেও ব্যক্তির ব্যক্তি-বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। এটা এই যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে মুক্তিলাভের পরে ব্যক্তির দেবত্বের উপলব্ধি হলেও পরম সত্তা ব্যক্তিতে পরিণত হয় না, বস্তুগতভাবে উভয়ের অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। সমস্যাটির যে সমাধান রাধাকৃষ্ণণ দিয়েছেন এটি কেবল তার একটি দিক। এটি কোনো চূড়ান্ত সমাধান নয়। কেননা ব্যষ্টি-মুক্তি মানুষের পরম নিয়তি নয়। ব্যক্তি মুক্ত হলেও তিনি বিশ্বজাগতিক প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত হন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সকলে পরিত্রাণ লাভ করে, ততক্ষন তাকে নিঃস্বার্থভাবে ও নিস্পৃহভাবে অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যেতে হবে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি দেবত্বের উপলব্ধি করলে তবেই জগৎ প্রক্রিয়া তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হবে। সুতরাং ব্যষ্টি মুক্তি নয়- সমষ্টি মুক্তিই মানুষের পরম নিয়তি, যাকে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ "সর্বমুক্তি" বলে অভিহিত করেন।

তথ্যসূত্রঃ

১। ঘোষ, ডঃ গোবিন্দ চরণ: সমকালীন ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা – ১৬৩

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১) Radhakrishnan, S: An Idealist View of Life, Harpercollins Publishers, India.

২) Lal, Basant Kumar: Contemporary Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi.

৩) ঘোষ, ডঃ গোবিন্দ চরণ: সমকালীন ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২০

৪) ভট্টাচার্য্য, ডঃ সমরেন্দ্র ও মুখোপাধ্যায়, গৌতমঃ সমকালীন ভারতীয় দর্শন, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১

৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নিখিলেশঃ বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫